ঔষধ নির্বাচনবিদ্যা

ডাঃ পরেশচন্দ্র সরকার

।। সূচীপত্র ।।

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	• ঔষধ নির্বাচনের গোড়ার কথা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	• হোমিওপ্যাথির মূল নীতি	৭
তৃতীয় অধ্যায়	• ঔষধ নির্বাচনপদ্ধতি	১৫
চতুর্থ অধ্যায়	• কারণতত্ত্বের সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন	২৫
পঞ্চম অধ্যায়	• লক্ষণসমষ্টির সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন	৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	• বোনিংহাউসেনপদ্ধতিতে ঔষধ নির্বাচন	৪৫
সপ্তম অধ্যায়	• ঔষধ নির্বাচনের ব্যবহারিক রীতি	৫৭
অষ্টম অধ্যায়	• আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত রোগের ক্ষেত্রে ঔষধ নির্বাচন	৬৫
নবম অধ্যায়	• সংক্রামকরোগের ঔষধনির্বাচন	৭১
দশম অধ্যায়	• চিররোগের ঔষধ নির্বাচন	৭৯
একাদশ অধ্যায়	• রোগিলিপি প্রস্তুতপ্রণালী	৮৭
দ্বাদশ অধ্যায়	• লক্ষণসমষ্টিনির্ধারণ ও ঔষধ নির্বাচন	১০৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়	• রেপার্টরির সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন	১১৩
চতুর্দশ অধ্যায়	• অচিররোগের ক্ষেত্রে রেপার্টরির সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন	১২১
পঞ্চদশ অধ্যায়	• চিররোগের ক্ষেত্রে রেপার্টরির সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন	১৩১
পরিশিষ্ট (১)	• ডাঃ গিবসন মিলারের শীত ও গরমকাতর ঔষধের তালিকা (মূল্যমান সহ)	১৪১
(২)	• রোগিবিবরণী	১৪৩
(৩)	• বর্ণানুক্রমিক সূচী	১৫১

এবং তাতেই সে ভালো বোধ করে। একজনের স্থির থাকলে বৃদ্ধি, নড়াচড়ায় উপশম। অন্যজন ঠিক এর বিপরীত—নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। প্রথমজনের ঠাণ্ডায় ও ঠাণ্ডা ঘরে বৃদ্ধি, দ্বিতীয়জনের উত্তাপ ও গরম ঘরে বৃদ্ধি। উভয়ের ঠাণ্ডা খাদ্য ও পানীয় পছন্দ। কিন্তু প্রথমজনের ঠাণ্ডা পানীয় পেটে গিয়ে গরম হলেই বমি হয়ে যায়। তবে সে আহারে উপশমবোধ করে। কিন্তু দ্বিতীয়জন প্রচুর পরিমাণে জলপান করে, এতে তৃপ্তিবোধও হয়। তবে আহারে উপশমের পরিবর্তে উপচয়বোধ* করে। প্রথমজনে উদরাময় নির্দিষ্ট, অন্যজনে দুর্দান্ত কোষ্ঠবদ্ধতা। এমনি আরও কত কি। এই দুটি রোগীকে এক বলা কি সঙ্গত? আমরা কোনমতেই দুই রোগীকে এক ঔষধ দিতে পারি না। তাই প্রথমজনের জন্য ব্যবস্থা করি ফসফরাস, দ্বিতীয়জনের জন্য ব্রায়োনিয়া। সব রোগেই এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।

রোগ ও রোগলক্ষণ: সব রোগের বেলায়ই ঐ এক কথা। সে জ্বরই হোক, নিউমোনিয়াই হোক বা কলেরা, টাইফয়েড, বাত, হাঁপানিয়াই হোক না কেন প্রতিটি মানুষ এক স্বতন্ত্র জীবন্তসত্তা। একথা সুস্থাবস্থায় যেমন সত্য রুগ্নাবস্থায়ও তেমনি। রোগাক্রমণে প্রতিটি মানুষের প্রতিক্রিয়ার ধরন আলাদা। রোগলক্ষণ হলো রোগশক্তির ক্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়ার ফল। তাই রোগ হলে রোগলক্ষণ থাকেই। চিকিৎসকের কাছে এরচেয়ে ধ্রুবসত্য আর কিছু নেই। রোগ হয়েছে অথচ কোন লক্ষণ নেই—এ অসম্ভব। কাজেই রোগলক্ষণের মাধ্যমেই কেবল রোগের ধারণা করা সম্ভব। রোগ যখন নিরাময় হয়ে যায় তখন তার লক্ষণও থাকে না। অর্থাৎ রোগের অস্তিত্ব ও বিনাশ রোগলক্ষণের প্রকাশ ও বিলয় সূচিত করে। রোগ ও রোগলক্ষণ তাই অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য। অতএব ঔষধ নির্বাচনে আমাদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হলো রোগলক্ষণ।

ঔষধ নির্বাচনের উদ্দেশ্য হলো রোগীতে প্রকাশিত লক্ষণরাজি স্থায়িভাবে দূর করে রোগের নিরাময় করা ও হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা। এই

---

* উপচয়বোধ—বৃদ্ধিবোধ

উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হলো রোগীতে প্রকাশিত লক্ষণরাজির মাধ্যমে রোগের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং ঐসব লক্ষণের সাহায্যে এমন একটি ঔষধ নির্বাচন করা যা যুগপৎ রোগলক্ষণ ও রোগকে দূর করবে।

ব্যক্তিমানুষের প্রতিক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আর সেই অবস্থার প্রতিকারে প্রযোজ্য ঔষধটি স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। ঔষধের বেলায় এই স্বাতন্ত্র্য আরও প্রকট। অ্যাকোনাইট যে ধরনের লক্ষণাবলী সৃষ্টি করে, ব্রায়োনিয়া বা আর্নিকা তা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন ঔষধই তা করতে পারে না। এজন্য একটি রোগাবস্থায় কেবলমাত্র একটি ঔষধই উপযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ একটি রোগ, একটি ঔষধ। একটি ঔষধের পরিবর্তে আরেকটি ঔষধ ব্যবহার করা চলে না। একটি রোগাবস্থার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ঔষধ। দুটি নয়। এ থেকে বোঝা যায় হোমিওপ্যাথি কত সূক্ষ্ম, কত নির্দিষ্ট এবং কত উন্নত।

রোগ চেনার উপায় যেমন তার লক্ষণ, ঔষধ চেনার উপায়ও তেমনি তার লক্ষণ। ঔষধের এই পরিচয় মেটিরিয়া মেডিকায় আছে। আমাদের কাজ হলো চিকিৎসিতব্য রোগটিকে প্রথমে তার লক্ষণাবলীর সাহায্যে যথার্থভাবে সনাক্ত করা; পরে মেটিরিয়া মেডিকা থেকে সদৃশনীতি অনুযায়ী একটি উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচন করা। এজন্য প্রয়োজন হ্যানিম্যানের অর্গ্যানন অব মেডিসিন এবং মেটিরিয়া মেডিকার জ্ঞান। ঔষধের পরিচয়ের জন্য আমাদের মেটিরিয়া মেডিকা পড়া ছাড়া কোন উপায় নেই এবং তা বারবার মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে।

ঔষধ নির্বাচনের জন্য প্রধানত যেসব মূল নীতির দ্বারা আমরা পরিচালিত, পরে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো

প্রথম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের বক্তব্য

- রোগের নাম অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন হয় না।
- প্রতিটি রোগী, রোগ ও ঔষধ স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই ঔষধ নির্বাচন করতে হয়।
- রোগ ও ঔষধে লক্ষণই ধ্রুব সত্য, লক্ষণই ঔষধ নির্বাচনের একমাত্র ভিত্তি।
- ঔষধ নির্বাচনের উদ্দেশ্য হলো রোগলক্ষণের স্থায়ী নিরসনের মাধ্যমে রোগের আমূল বিনাশসাধন।
- ঔষধ নির্বাচনের উপায়—লক্ষণসমষ্টির নির্ধারণ ও সদৃশনীতির সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন।

হোমিওপ্যাথির মূল নীতি

চিকিৎসাশাস্ত্র মূলত প্রযুক্তি বা প্রয়োগকৌশল। ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ আরোগ্য করাই চিকিৎসকের কাজ কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন একটা সুদৃঢ় তত্ত্বগত ভিত্তি। হোমিওপ্যাথির মূল নীতি এই ভিত্তি গড়ে তোলে। এখানে এর প্রধান ছয়টি নীতি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।*

(ক) স্বাস্থ্য ও রোগবিষয়ক নীতি: মানুষ এক অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তা। মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন সমগ্রভাবেই সুস্থ থাকে। আর যখন অসুস্থ হয় তখন সমগ্র মানুষটিই অসুস্থ হয়। তার হাত, পা বা মাথা অসুস্থ হয় না। স্বাস্থ্য হলো দেহতন্ত্রের এক সাম্যাবস্থা, যে অবস্থায় সব রকমের জৈবিক প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী দেহতন্ত্র তার স্বাভাবিক ক্রিয়া করে।

রোগাক্রমণে এই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। আত্মরক্ষার্থে দেহী তখন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে তার দেহমনে কতকগুলি অসুখকর উপসর্গ দেখা দেয় যাকে সাধারণভাবে আমরা রোগ বলে থাকি। আসলে এগুলি রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। রোগ হলো দেহীর অভ্যন্তরের বিশৃঙ্খল অবস্থা। দেহীর এই আভ্যন্তরবিশৃঙ্খলাহেতু সৃষ্ট পীড়া এবং তজ্জনিত বহিঃপ্রকাশিত বোধগম্য সমুদয় লক্ষণের সত্তা এক ও অভিন্ন। দেহতন্ত্রের বিশৃঙ্খল অবস্থার আভ্যন্তররূপ হলো রোগ; আর তার বাহ্যিক প্রতিরূপ হচ্ছে লক্ষণসমষ্টি।

ঔষধ প্রয়োগের ফলে যদি এই আভ্যন্তর বিশৃঙ্খল অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে এবং বহিঃপ্রকাশিত লক্ষণাবলীর স্থায়ী বিলোপ ঘটে তাহলে আমরা তাকে বলি আরোগ্য।

---

* আমার লেখা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আরোগ্যকলা বইতে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

তাৎপর্য: (১) যেহেতু, রোগ দেহীর এমন একটা অবস্থা যা দেখা যায় না অথচ তার যেসব সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকে তা দেখা ও বর্ণনা করা যায়; যখন রোগ থাকে না তখন এসব লক্ষণও আর থাকে না অতএব ঔষধ নির্বাচনে এসব লক্ষণের ওপর নির্ভর করাই সব থেকে বিশ্বস্ত পথ।

(২) একটি অবস্থার প্রতিকৃতি একটিই হতে পারে। এজন্য বহিঃপ্রকাশিত লক্ষণাদি সমগ্রভাবে এমন এক অখণ্ড চিত্র তুলে ধরে যা দেহের রোগের এক অবিকল প্রতিরূপ বহন করে। এই অখণ্ডচিত্রের সমষ্টিকে লক্ষণ বলে। লক্ষণসমষ্টিই ঔষধ নির্বাচনের একমাত্র ভিত্তি।

(৩) আর লক্ষণ যেহেতু কেবলমাত্র একটি ঔষধই নির্দেশ করতে পারে সেইহেতু কোন একটি অবস্থার জন্য কেবলমাত্র একটিমাত্র ঔষধই উপযুক্ত হতে পারে। একসঙ্গে বা পর্যায়ক্রমে একাধিক ঔষধ প্রয়োগ কখনও হোমিওপ্যাথিক হতে পারে না।

(৪) চিকিৎসার লক্ষ্য হলো রুগ্ন, সম্পূর্ণ, অখণ্ড মানুষ। তার দুএকটি অঙ্গ নয়। এজন্য আমরা মাথা, দাঁত বা পেটের রোগের চিকিৎসা করি না। আমরা এমন এক রোগীর চিকিৎসা করি যার রোগ প্রধানত মাথা, দাঁত বা পেটের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে, যদিও সমগ্র মানুষটিই পীড়িত। চিকিৎসাক্ষেত্রে আমরা এই রুগ্ন মানুষটিকেই সর্বদা কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে অগ্রসর হই। মাথাব্যথার জন্য বেলাডোনা বা ব্রায়োনিয়া, দাঁতের ব্যথার জন্য মার্কিউরিয়াস সল, ক্রিয়োজোট বা পেটের অসুখের জন্য নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা—এভাবে রোগভিত্তিক ঔষধ গোষ্ঠীবদ্ধ করা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। যে কোন রোগে যে কোন ঔষধই যে উপযুক্ত হতে পারে সেকথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

(৫) এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে যে, রোগ হচ্ছে একটা গতিশীল প্রক্রিয়া। তার সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি আছে। প্রথমে রোগীর মানসিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তারপর যথাক্রমে সার্বদৈহিক ও দৈহিক লক্ষণ এবং সব শেষে বিকারতত্ত্বীয় (pathological) লক্ষণ প্রকাশ পায়। এজন্য ঔষধ নির্বাচনে মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব যেমন

সবচেয়ে বেশি তেমনি বিকারতত্ত্বীয় লক্ষণের গুরুত্ব সবচেয়ে কম। এই কারণে অর্শ, অর্বুদ, ঘা ইত্যাদি রোগ নয়, রোগের পরিণামফল। রোগের সূচনা হয়েছিল বহু আগেই। কাজেই এই পরিণামফল আমাদের চিকিৎসার লক্ষ্য নয়। এগুলি কোনভাবে চাপা দিলে বা দূর করলে রোগ আরোগ্য হয় না বরং তা জটিল আকার নেয়। অন্যদিকে রোগী যদি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করে তবে এগুলি আপনা থেকেই চলে যায়।

(খ) আরোগ্যবিষয়ক নীতি: চিকিৎসকের মহৎ ও একমাত্র উদ্দেশ্য হলো রোগীর হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার, যাকে আরোগ্যবিধান বলা হয়। আরোগ্যবিধানের উচ্চতম আদর্শ হলো, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ উপায়ে, বিনা কষ্টে এবং সহজবোধ্য নীতির সাহায্যে সমগ্রভাবে রোগের দূরীকরণ ও বিনাশ।

তাৎপর্য: (১) আরোগ্য হলো প্রযুক্তি বা প্রয়োগকৌশলের প্রত্যক্ষ ফল। ঔষধ কি উদ্দেশ্যে নির্বাচন ও প্রয়োগ করছি এবং তার ফলে আমরা কি আশা করছি সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

(২) আরোগ্যক্রিয়া হবে দ্রুত, মৃদু ও স্থায়ী, তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটবে না। এক রোগ চাপা পড়ে অন্য রোগ হবে না। হোমিওপ্যাথিতে রোগ সারতে দেরি হয়, রোগের প্রথমে খুব বৃদ্ধি ঘটে, রোগীকে দীর্ঘকাল ধরে কষ্টভোগ করতে হয় এসব ধারণা ভুল। অনুপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগজনিত রোগের বৃদ্ধিকে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলে যেন আমরা ভুল না করি। ঔষধ নির্বাচনে রোগীর কষ্টকর অবস্থার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

(৩) আরোগ্যক্রিয়া নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলে। এই বিষয়ে হেরিংয়ের সূত্র হলো: আরোগ্যক্রিয়ার অভিমুখ কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে, ভিতর থেকে বাইরের দিকে, উঁচু থেকে নিচু দিকে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে এবং লক্ষণ যেভাবে হাজির হয়েছিল তার পশ্চাদ্‌গতিতে অপসরণ। ঔষধ প্রয়োগের ফলে রোগলক্ষণ যদি এর বিপরীত অভিমুখ বা পথ ধরে তবে শীঘ্র প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

(গ) সদৃশনীতি: প্রাণিদেহে ভিন্ন উৎস থেকে জাত প্রাকৃতিক রোগ আরেকটি (সদৃশ) বলবত্তর রোগ দ্বারা স্থায়িভাবে নির্মূল হয়। অর্থাৎ একটি রোগদ্বারা আরেকটি রোগকে দূর করতে হয়। প্রথম রোগটি হলো প্রাকৃতিকরোগ যা কোন রোগশক্তি দ্বারা প্রাণিদেহে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় রোগটি হলো কৃত্রিমরোগ যা ঔষধ প্রাণিদেহে সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক রোগশক্তি প্রাণিদেহে যে রকম পরিবর্তন করে লক্ষণ সৃষ্টি করেছে যদি কোন ঔষধ সেই রকম পরিবর্তন ঘটিয়ে অনুরূপ লক্ষণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে তবে সেই ঔষধটিই সেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করবে।

তাৎপর্য: (১) সদৃশনীতির ওপর ভিত্তি করেই কেবল উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচন সম্ভব।

(২) ঔষধও প্রাকৃতিক রোগশক্তির মতো রোগ সৃষ্টি করে। কাজেই যথেচ্ছভাবে ঔষধ প্রয়োগে নতুন ও জটিলরোগের সৃষ্টি হয়।

(৩) ঔষধ নির্বাচনের আগে অবশ্যই জানতে হবে সেই ঔষধটি কি ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ঔষধের রোগোৎপাদিকা শক্তিই রোগীতে আরোগ্যদায়ক শক্তিরূপে কাজ করে। ঔষধের এই শক্তির পরিচয় মেটিরিয়া মেডিকায় আছে। কাজেই মেটিরিয়া মেডিকায় জ্ঞান থাকা চিকিৎসকের একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে মেটিরিয়া মেডিকায় ভালো জ্ঞান না থাকলে উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচন অসম্ভব।

(৪) সাদৃশ্য বলতে বোঝায় রোগের লক্ষণের সঙ্গে ঔষধসৃষ্ট লক্ষণের সার্বিক সাদৃশ্য, রোগের দুএকটি লক্ষণের সঙ্গে সাদৃশ্য নয়। ঔষধ নির্বাচন তখনই সঠিক হবে যখন এই সাদৃশ্য সম্পূর্ণ হবে।

(ঘ) ক্ষুদ্রতম মাত্রানীতি: ঔষধশক্তি রোগশক্তি থেকে বলবত্তর বলে রোগীতে ঔষধ এমন অবস্থায় এবং এমন পরিমাণে দিতে হবে যাতে রোগীর প্রাণসত্তা মৃদুভাবে উদ্দীপিত হয়ে অভীপ্সিত পরিবর্তন আনতে পারে এবং অচিরেই তার ক্রিয়া শেষ হয় অর্থাৎ রোগলক্ষণ ও ঔষধলক্ষণের সাদৃশ্যহেতু তা একত্রে মিশে যাওয়ার অনতিপরে যাতে সব লক্ষণ বিলীন হয়ে যায় এবং রোগী তার পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পায়।

তাৎপর্য: (১) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শক্তীকৃত অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। ঔষধের ক্রিয়াচলাকালীন আর দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করতে নেই।

(২) সুনির্বাচিত ঔষধও উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় প্রয়োগ না হলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না কেননা এই অবস্থায় রোগ ও ঔষধের গুণগত সাদৃশ্য সম্পূর্ণ হয় না।

(৩) সদৃশতম ঔষধ নির্বাচিত হলে রোগলক্ষণের স্বল্পকালীন বৃদ্ধি হতে পারে যদিও রোগী তা সত্ত্বেও ভালো বোধ করবে। এই বৃদ্ধিকেই হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলে। এই বৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা যায় যদি ঔষধ উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়।

(ঙ) স্বাতন্ত্রীকরণনীতি: প্রত্যেকটি মানুষ যেমন আলাদা, প্রতিটি রোগও তেমনি আলাদা। আর প্রতিটি ঔষধতো আলাদা বটেই। অতএব সবক্ষেত্রেই রোগীকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে তার স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে এবং তদনুযায়ী উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

তাৎপর্য: (১) হোমিওপ্যাথিতে সাধারণীকরণের কোন স্থান নেই। রোগের নাম ধরে চিকিৎসা হোমিওপ্যাথির নীতিবিরুদ্ধ।

(২) ঔষধ নির্বাচন, শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ, পথ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি চিকিৎসাকার্যের সব ক্ষেত্রে আমরা এই স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির দ্বারা পরিচালিত হই। এটা মূলত বাছাইকরণ প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে আমরা বহু থেকে একে পৌঁছাই, অনেক রোগ থেকে একটি বিশেষ রোগে পৌঁছাই এবং অনেক ঔষধ থেকে সদৃশতমটিকে খুঁজে বের করি।

(চ) রোগের শ্রেণীবিভাজননীতি: হোমিওপ্যাথিতে যাবতীয় প্রাকৃতিকরোগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা (ক) অচিররোগ (acute disease) এবং (খ) চিররোগ (chronic disease)। এদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অচিররোগের সূচনা ও বিকাশ হয় অতি দ্রুত লয়ে। ফলে রোগের পরিচয় জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। এর ক্রিয়াকালও সীমিত। এর একটা বিশেষ দিক হলো, রোগীর আরোগ্য বা মৃত্যুতেই এর পরিসমাপ্তি

ঘটে। অচিররোগ সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস। কোন উদ্দীপক কারণে সুপ্ত সোরা জাগ্রত হয়।

চিররোগের সূচনা হয় অতি সঙ্গোপনে, বিকাশ হয় অতি ধীর লয়ে। এর বিশেষ দিক্ হলো রোগীর মৃত্যুতেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে। সোরা, সিফিলিস বা সাইকোসিস একক বা মিলিতভাবে এ রোগ উৎপন্ন করে।

তাৎপর্য: (১) রোগীর বক্তব্য শোনার পরে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে রোগ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। দুটি ক্ষেত্রে চিকিৎসাব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

(২) অচিররোগ হলে দ্রুত ক্রিয়াশীল কোন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে এবং রোগীর অবস্থা সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

(৩) অচিররোগটি যদি সংক্রামক হয় তবে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৪) চিররোগের ক্ষেত্রে কোন দীর্ঘক্রিয় চিররোগবিষনাশক ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

সবক্ষেত্রেই রোগিলিপি প্রস্তুত করতে হবে। তবে চিররোগের ক্ষেত্রে রোগিলিপি অবশ্যই বিস্তারিত হওয়া দরকার।

এসব তত্ত্বমূলক আলোচনা থেকে ঔষধ নির্বাচনের জন্য আমরা তিনটি মূল সূত্র উদ্ভাবন করতে পারি। যথা:

(১) আমাদের চিকিৎসার লক্ষ্য হলো রোগী। তার সব রোগলক্ষণ স্থায়িভাবে দূর করে তাকে পূর্বস্বাস্থ্যে ফিরিয়ে দেওয়া।

(২) আমাদের চিকিৎসার নীতি হলো সদৃশনীতি। রোগীর রোগলক্ষণের অনুরূপ লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে এমন একটি ঔষধ নির্বাচন।

(৩) আমাদের চিকিৎসার পথ হলো লক্ষণসমষ্টি নির্ধারণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যরাজির মাধ্যমে লক্ষণসমষ্টি নির্ধারণ করতে হবে এবং মেটিরিয়া মেডিকা থেকে সদৃশনীতি অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করে উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় তা প্রয়োগ করতে হবে। চিররোগের ক্ষেত্রে তা করার আগে রোগের মূল কারণের অনুসন্ধান অবশ্যই করতে হবে।